আপনার শিশু কি লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে?

শ্রী মায়া গুহ

শিশু লালনী গ্রন্থমালা

বাবা-মারা সকলেই প্রতিনিয়ত শিশুকে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করছেন কিন্তু তাঁদের চেষ্টা-যত্ন সত্ত্বেও প্রায়ই তাঁরা ছোটদের নিয়ে নানান মুস্কিলে পড়েন—এ নিয়ে তাদের মনে নানান জিজ্ঞাসাও জাগে। বাস্তবিকই ছোটদের মনকে খুব ছোটবেলা থেকে ঠিক মত বুঝতে ও পরিচালিত না করতে পারলে, পরবর্তীকালে বাবা-মাদের নানান অসুবিধায় পড়তে তো হয়ই—তা ছাড়াও মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বয়স্কদের মধ্যেও সময় সময় যেসব মানসিক ব্যাধি দেখা যায়, তারও মূল নিহিত থাকে, শিশুকালে মন তার সহজ গতিতে বিকাশ লাভ না করতে পারার মধ্যে। কাজেই শিশুদের সেই বহুবিচিত্র মনের ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অভিভাবকরা যাতে ছোটদের স্বাধীন দেশের উপযোগী সুস্থ ও সবল মনা প্রয়োজনীয় নাগরিক করে গ'ড়ে তুলতে পারেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে, শিশু লালন ও পরিচালন সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করে, এই পুস্তিকামালা প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে।

শিশু-মনোবিজ্ঞানের মতন একটি জটিল বিষয়কে যাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপন রচনা সম্ভারে সহজ ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার ভার নিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নাই—তাই আশা করি শিশু ও কিশোর কল্যাণকামী মাত্রেই এই প্রচেষ্টাকে সমাদৃত করে তাঁদের সমাদর করবেন।

সম্পাদক

শিশুলালনী গ্রন্থমালা ঃ তৃতীয় পুস্তিকা

আপনার শিশু কি লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে?

শ্রীমায়া গুহ এম, এস্‌-সি,

কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র
হাওড়া

ভূমিকা

আজকের দিনে শিশু-মনোবিজ্ঞানের মতন একটি বিষয়কে সাধারণের কাজে লাগাবার যে অতি প্রয়োজন আছে, তা কেউই অস্বীকার করেন না। বস্তুতঃ বিজ্ঞান যখন মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হয়, তখনই তার যথার্থ সার্থকতা। বিশেষভাবে সে বিজ্ঞান যদি ব্যক্তি—তথা পরিবার ও সমগ্র সমাজের ভবিষ্যতের সুখ, শান্তি ও পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে দৃষ্টি দেয়, তবে তার দানকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। এই পুস্তিকার উদ্যোক্তরা তাই যখন আমাকে "জড়বুদ্ধি শিশু"দের পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু লিখে দিতে অনুরোধ জানান, তখন বিজ্ঞানের এই কল্যাণকর দিকটির কথা ভেবে আমি সানন্দে তাঁদের কাজে সাহায্য করার স্বীকৃতি জানাই। কিন্তু বাস্তবে গিয়ে দেখি, তথা-কথিত "জড়বুদ্ধি শিশু"দের মানুষ করে তোলা সাধারণ মা-বাবার পক্ষে এক রকম অসম্ভবই; একমাত্র বিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় এদের আংশিক ভাবে সমাজের উপযোগী ও আত্মনির্ভরশীল মানুষ করে তোলা সম্ভব। তবে এদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে এমন আর এক-শ্রেণীর শিশুদের কথা আমার মনে হয়, যাদের সম্ভাবনা থাকা সত্বেও, ঠিকমত পরিচালনার অভাবে ও ভুল বোঝার ফলে মানসিক বৃত্তিগুলি পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে না ; ফলে তারা বোকা বলেই পরিচিত হয়—চিরকাল সকলের পিছনেই—রয়ে যায়। এরকম শিশু প্রায় সাধারণ সব পরিবারেই মাঝে মাঝে দেখা যায়। এদের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ে হাল ছেড়ে দেবার আগে, যদি মা-বাবারা এদের 'পিছিয়ে পড়া'র কারণগুলি অনুসন্ধান করেন ও সেইমত প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন, তা হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা লাভবান হবেন। তাঁদেরকে এই কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাবে এই পুস্তিকাখানিতে 'পিছিয়ে পড়া' শিশুদের কথা আলোচিত হলেও প্রসঙ্গক্রমে 'জড়বুদ্ধি শিশু'দের কথাও প্রয়োজন মত বলার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজেই পুস্তিকাটি 'জড়বুদ্ধি শিশু'র পরিপূরক পুস্তিকা হিসাবে গ্রহণ করতে উৎসুক পাঠকদের কোন অসুবিধা হবে না বলেই বোধ করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বিভাগ
২৫শে মার্চ, ১৯৫১। মায়া গুহ

আপনার শিশু কি লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে ?

ওপরের কথাটা নিশ্চয়ই আপনাকে ভাবিয়ে তুলছে ; তুলবেই। আপনি যদি বাবা কিংবা মা হন, তা হলে কথাটা না ভেবেই পারবেন না। কারণ, শিশু পিতামাতার বড় আদরের জিনিষ। বড় হয়ে শিশু যাতে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার জীবন যাতে সবদিক দিয়েই বিকশিত হয় সেই চেষ্টাই আপনারা অনুক্ষণ করছেন। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় যে, মাতা-পিতার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও শিশুটি সুস্থ ও সবল দেহ-মনের অধিকারী হতে পারছে না। আর পাঁচটি শিশুর থেকে ক্রমেই সে পিছিয়ে পড়ছে। কেন এই শিশুটী অন্য সবার সাথে সমান তালে চল্‌তে পারছে না, এটা অনেক ভেবেও তার অভিভাবকেরা বা চারপাশের আত্মীয়-স্বজন, হিতাকাঙ্খীরা বুঝতে পারেন না।

আমরা জানি যে, শিশুর জন্মক্ষণ হ'তেই শিশুর দেহ পুষ্টি লাভ করতে থাকে। শিশুর দেহ পুষ্টির সাথে সাথেই তার মানসিক বৃত্তি-গুলিও বিকশিত হয়। বয়সের সাথে-সাথে শিশুটি পৃথিবীর সাথে পরিচিত হয়। তারপর এমন একদিন আসে যখন মহা আড়ম্বরের সঙ্গে শিশুটির হাতেখড়ি হয়। খেলার সাথীদের পাশেই হয়তো তাকে বিদ্যালয়ে গিয়ে বস্‌তে হয়। তার ছোট মাথাটি দিয়ে পাঠ্য পুস্তকের জটিল তথ্যগুলি বোঝবার চেষ্টা করতে হয়, কঠিনতর বিষয়গুলি আয়ত্তে আনতে হয়। কিন্তু দেখা যায়, সব শিশুর পক্ষে একই সময়ে সমান ভাবে বিষয়গুলি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কেউ খুব অল্প সময়েই তার পাঠ সুন্দরভাবে শিখে নিতে পারে. কেউ তা

পারে না। ফলে দেখা যায়, একই শ্রেণীর কয়েকটি শিশু অন্য শিশুদের চাইতে এগিয়ে গেছে, কয়েকজন বা পিছিয়ে গেছে। শিক্ষক এই পিছিয়ে-পড়া শিশুটির জন্য অপেক্ষা করতে পারেন না— অন্যান্য শিশুরাও তাদের এই সঙ্গীটির জন্য সময় নষ্ট করতে পারে না। ধীরে ধীরে সমবয়স্ক শিশুদের পড়াশুনা শিশুটির কাছে খুবই শক্ত বলে মনে হয়। ফলে, হয়তো তাকে অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে পাঠ নিতে হয়। এতে শিশুটির আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। সে নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে ও ক্রমে আত্মমর্যাদা বা আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে সে এত বেশী সচেতন হয়ে পড়ে যে, বাইরের পৃথিবীর সাথে মিশতে লজ্জা বোধ করে। ফলে, ভবিষ্যতে শিশুটি কিছুতেই সুস্থ মনের অধিকারী হতে পারে না। কেন শিশুরা এমনটি হয় ভেবে দেখেছেন কি ?

পিছিয়ে পড়ার কারণ

শিশুদের এই পিছিয়ে পড়ার কারণ নিয়ে অনেক অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, শিশুদের এই অক্ষমতা প্রায় ষাটটি কারণে হতে পারে। এর থেকে বলা যায় যে, সব শিশুর পিছিয়ে পড়ার কারণ এক নয়। অন্য সব কারণ ছেড়ে দিলেও দেখা যায় যে, প্রত্যেক 'পিছিয়ে পড়া' শিশুরই অক্ষমতার কারণ অন্ততঃপক্ষে তিনটি। এইসব কারণের কতকগুলি দৈহিক, কতকগুলি মানসিক, কতকগুলি শিশুর সহজাত ও কতকগুলির জন্য আবার শিশুর পারিপার্শ্বিক অবস্থাও দায়ী। শিশুদের পিছিয়ে পড়ার জন্য এই কারণগুলির কোনটা কমবেশী কতখানি দায়ী, তা সঠিক ভাবে বলা না গেলেও, মনস্তাত্বিকদের আবিষ্কৃত তথ্য হতে জানা যায় যে, এই পিছিয়ে পড়ার জন্য দায়ীঃ $\frac{৩}{৪}$ অংশ শিশুর দৈহিক অসুস্থতা, $\frac{২}{৩}$ অংশ শিশুর সামাজিক ব্যবস্থা, $\frac{১}{৩}$ অংশ শিশুর

প্রকৃতিগত দোষ, ৩/৪ অংশ শিশুর বুদ্ধির স্বল্পতা ও ১/৩ অংশ শিশুর বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা।

শিশুর শারীরিক অসুস্থতা

প্রথমে শিশুর দৈহিক অসুস্থতা শিশুর পিছিয়ে পড়ার জন্য কতখানি দায়ী দেখা যাক। শিশুর শরীর যদি সুস্থ না থাকে তবে তার কোন বিষয়েই উৎসাহ আস্‌তে পারে না। সেক্ষেত্রে তার বিদ্যালয়ের পাঠে মন দেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে, সেজন্য মাতা-পিতার বা অভি-ভাবকদের শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শিশু সামান্য অসুস্থ হলেই তার যথাবথ ব্যবস্থা ও প্রয়োজনমত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। যে শিশু সর্বদাই একটা না একটা অসুখে ভোগে, ভালভাবে লেখাপড়া করা তার পক্ষে খুবই শক্ত। শিশুর পক্ষে শরীর রক্ষার জন্য সবচাইতে প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্য, আলো হাওয়ায় খেলাধূলা করা, ব্যায়াম ইত্যাদি। অনেক সময় শিশুকে দেখতে অসুস্থ মনে না হলেও তার চোখ বা কানের দোষ থাকতে পারে। শিশু হয়তো স্পষ্ট দেখতে পায় না কিংবা হয়তো ভাল করে শুনতে পায় না। কিন্তু পড়া যদি ঠিক মতো শুন্‌তে না পায় তাহলে পাঠ্য-বিষয়ে শিশুর মনঃ সংযোগ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। ভাল করে বোর্ডের লেখা না দেখতে পেলেও পড়া বোঝা শিশুর পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কেবলমাত্র চোখ,-কানের দোষই শিশুর বিদ্যালয়ে 'পিছিয়ে পড়া'র কারণ হতে পারে। এসব দোষ সম্বন্ধে উপযুক্ত যত্ন নিলে, শিশু আবার অল্প দিনেই পাঠে মনঃসংযোগ করতে পারে। কাজেই বাবা-মা যদি দেখেন যে, কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও শিশু তারই বয়সী সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে চলেছে, তাহলে প্রথমেই তাঁদের উচিত,

তার দৈহিক সুস্থতা সম্বন্ধে খোঁজ করা। প্রথম থেকেই এদিকে দৃষ্টি দিলে ভবিষ্যতের অনেক বিপদই কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে।

চোখ, কান বা অপর কোন অঙ্গের দোষ যদি না থাকে, তাহলেই শিশুটি যে সম্পূর্ণ সুস্থ, তা মনে করা একেবারেই ভুল। কারণ মানুষের শরীরের মধ্যে এমন কতকগুলি ছোটখাটো কলকব্জা আছে যেগুলির কাজই হলো দেহকে গড়ে তোলার সাথে সাথে, তার মানসিক বৃত্তি-গুলিকেও গড়ে তোলা। এগুলিকে বলা যেতে পারে 'গ্রন্থি'। ওষুধ যেমন রক্তের সাথে মিশে শরীরের ওপর কাজ করে, তেমনি এই সব 'গ্রন্থি' থেকে এক রকমের রস নিঃসৃত হয়ে, রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে, আমাদের দেহ ও মনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কাজেই শিশুর যদি কোন গ্রন্থির দোষ থাকে, তা হলে তার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না।

যে সব গ্রন্থিগুলি বিশেষভাবে মানুষের মনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, তদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হলো, শ্বাসনালীর পাশে যে দুটি 'গ্রন্থি' আছে সেই দু'টি। এদের নাম 'থাইরড গ্রন্থি'। যদি কোন কারণে এই গ্রন্থির কার্যক্ষমতা ব্যাহত হয়, তাহলে গায়ের চামড়া খস্খসে হয়ে পড়ে, শরীরের পেশী ও মস্তিষ্ক তাদের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, শিশুটীর স্মরণশক্তি কমে যায়, সে কোন কাজে মন দিতে পারে না। জন্ম থেকেই যদি শিশুর এই 'গ্রন্থি' সুস্থ না থাকে তাহলে তার শারীরিক পুষ্টি ও বুদ্ধি বিকাশের অভাব তো ঘটেই, তাছাড়াও শিশুটি 'বামন' হয়ে থাকে আর পরিণত বয়সেও বুদ্ধি শিশুর মতই রয়ে যায়। যদি উপযুক্ত সময়ে এই শিশুটির চিকিৎসা করা হয় তবে তার এ দোষ সারতে খুব বেশী সময় লাগে না এবং শীগ্‌গিরি সে অন্য শিশুদের সমান পর্যায়ে আসতে পারে। 'থাইরড গ্রন্থি' ছাড়াও এই জাতের অন্য গ্রন্থিগুলিও শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অন্যান্য গ্রন্থির মধ্যে

'টনসিল' ও 'এডিনয়েড' গ্রন্থিগুলির বৃদ্ধি হলে শিশুর মানসিক বিকাশের বাধা সৃষ্টি হয়। 'এডিনয়েড' গ্রন্থিগুলি থাকে নাকের পিছন দিকে। এর দোষ থাকলে শিশুর আকৃতিতে একটু নির্বোধের ছাপ পড়ে। তার মানসিকবৃত্তির যথাযথ বিকাশ হতে পারে না। এছাড়া ছোটখাট অসুখ, যেমন দাঁত ব্যথা, মাথাধরা, জ্বর, প্রভৃতি যদি প্রায়ই হয়, তাহলেও শিশু দুর্বল হয়ে পড়ে ও পাঠে মন দিতে পারে না।

শিশুর পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক ব্যবস্থা

শিশুর অক্ষমতার জন্য তার সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অনেকাংশে দায়ী। সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, 'পিছিয়ে পড়া' শিশুদের মধ্যে প্রায় শতকরা বিশজন শিশুর পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত দরিদ্র এবং দেখা গেছে, শতকরা আটজন 'পিছিয়ে পড়া' শিশুর শক্তি ও স্বাস্থ্য এই দরিদ্রতার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে।

পরিবারের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে শিশুর লেখাপড়ার যোগ থাকলেও এক্ষেত্রে কিন্তু সব চাইতে অধিক প্রয়োজনীয় শিশু-লালনে মাতার দক্ষতা। শিশুর জীবনে তার মায়ের প্রভাব খুব বেশী। শৈশবের কয়েকটা বছর সে তার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষের জন্যই তার মায়ের উপর নির্ভর করে। শিশুর স্নান, ভোজন ও স্বাস্থ্যের দিকে মা যতটা দৃষ্টি রাখেন, শিশুর বুদ্ধি ও মানসিক বৃত্তিগুলি বিকাশের দিকেও যদি ততটা নজর দেন, তাহলে শিশুর ভবিষ্যত-জীবন গঠনে উপকার হয় প্রচুর। ছোট ছোট গল্প, উদাহরণের সাহায্যে মা শিশুর বুদ্ধি উন্মেষে সাহায্য করতে পারেন। মা যদি স্বল্পবুদ্ধির অধিকারিনী হন, অথবা তাঁর প্রকৃতিতে যদি স্থৈর্যের অভাব, বা অন্য কোন মানসিক দৌর্বল্য বা মানসিক বিকৃতি থাকে, তবে সেটা শিশুর স্বাভাবিক, মানসিক ও নৈতিক জীবনের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

শিশুর বিদ্যালয়ের বাইরের জীবন শুধু তার মাতাপিতা কিংবা আত্মীয়-স্বজনকে নিয়েই নয়। শিশুর চারপাশের লোকজন, তার সঙ্গী সাথীরাও তার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর সঙ্গী নির্বাচন যদি ঠিক না হয়, সঙ্গীরা যদি দুষ্ট প্রকৃতির হয় তবে শিশুর প্রকৃতিও অনেকটা সেইরকম হয়। ক্রমে ক্রমে লেখাপড়ার দিকে তার মনোযোগ কমে যায় ও সব সময় সে তার সঙ্গীদের সাথে খেলাধূলাতেই নষ্ট করে। অভিভাবকেরা শিশুর সঙ্গী নির্বাচনে সাহায্য করলে ও দুষ্ট সঙ্গীদের থেকে শিশুকে দূরে রাখলে, অল্পদিনেই শিশুর মন পাঠ্যপুস্তকে আবার ফিরে আস্‌তে পারে।

শিশু যে-সামাজিক স্তরে জন্মগ্রহণ করে, তার বুদ্ধিও অনেকটা সেই অনুপাতেই হয়। যদিও অনেকে একথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন তবুও এটা সহজেই বোঝা যায় যে, যাঁরা বংশানুক্রমিক ভাবে বুদ্ধিবৃত্তিকে পেশা করে জীবন ধারণ করছেন, তাঁরা তাঁদের বুদ্ধি উন্মেষ করতে যথেষ্ট সচেষ্ট। বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন করাতে তাঁরা চিরকাল তাই নিয়েই থাকেন এবং তার উৎকর্ষ সাধনের জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করেন, এতে তাঁদের বুদ্ধি মার্জিত হয়। অপরপক্ষে যাঁরা দৈহিক শক্তিকে জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় বলে ধরে নিয়েছেন, তাঁদের বুদ্ধি থাক্‌লেও চেষ্টার অভাবে বা তার চালনার অভাবে বিকশিত হতে পারে না। বংশানুক্রমিক ভাবে বুদ্ধির চালনাতে বুদ্ধি যেমন মার্জিত হয়, ঠিক তেমনি তার চালনার অভাবে ভোঁতাও হয়ে যায়। ইস্পাতের কোন অস্ত্রকে যেমন ধার দিলে তা দিয়ে অনেক কাজ হয় এবং তার চালনার অভাবে যেমন তাতে মর্‌চে ধরে, বুদ্ধির বেলাতেও ঠিক তাই। বংশানুক্রমিকভাবে একই ধরণের বৃত্তি জীবিকা নির্বাহের উপায় বলে ধরে নেওয়াতে, বৃত্তি হিসাবে বুদ্ধির মানের কিছু তারতম্য হতে দেখা যায়।

বহু অনুসন্ধান ও বহু গবেষণার পর মনস্তাত্ত্বিকেরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার ফল নীচে বুদ্ধির মান অনুসারে বৃত্তিগুলি পর পর সাজিয়ে দেওয়া হ'লো।

১। স্বাধীন ব্যবসা (ডাক্তারী, ওকালতি প্রভৃতি)

২। কেরানীগিরি

৩। শিল্পী

৪। কারিগর

৫। কৃষিকাজ

৬। মজুরের কাজ

শিশু নিম্ন-সামাজিক স্তরে জন্মগ্রহণ করলেই যে তার বুদ্ধি খুব কম হবে, তা বলা যায় না। সমাজের নিম্নস্তরে জন্মগ্রহণ করেও দেশবরেণ্য হয়েছেন, এমন লোকেরও অভাব নেই ; তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে সবক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম হতে পারে।

শিশু যাতে তার বুদ্ধি চালনার দিকে যথেষ্ট মন দেয় সেদিকেও অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, শিশু উচ্চবুদ্ধির অধিকারী হলেই যে, সে তার ফল যথাযথ ভোগ করতে পারবে, এমন নয়। কাজে যদি শিশুর ধৈর্য না থাকে, তার মন আর লক্ষ্য যদি স্থির না হয়, পাঠশালায় সে যদি বদ্‌খেয়ালে মত্ত থাকে—তাহলে তার সহজাত উচ্চবুদ্ধি কখনই তাকে উন্নতির পথে বেশীদূর নিয়ে যেতে পারবে না।

কিন্তু অপরপক্ষে যে-শিশু কমবুদ্ধিমান অথচ স্থির, ধীর, কাজে আগ্রহশীল, সে হয়তো জীবন পথে বুদ্ধিমান অথচ ধৈর্যহীন শিশুটির চেয়ে বেশী এগিযে যেতে পারে। যে-সব শিশু সবার আগে এগিয়ে চলে, তারা উচ্চবুদ্ধির অধিকারীতো হয়ই, তাছাড়াও তাদের থাকে মনের দৃঢ়তা, স্থৈর্য আর লক্ষ্য।

শিশুর সামাজিক স্তর সম্বন্ধে যে কথা আমরা আলোচনা করছিলাম, তার সম্বন্ধে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে, শিশুর বাড়ী আর সামাজিক পরিবেশও তার লেখাপড়ায় এগিয়ে বা পিছিয়ে যাওয়ায় অনেকখানি সাহায্য করে থাকে। পাঠশালায় ছেলেরা আসে নানান সমাজ, নানান পরিবারের থেকে। যেমন, কেউ আসে এমন বাড়ী থেকে যেখানে আছে লেখাপড়ার আলাপ আলোচনা, খেলাধূলার চর্চা, যেখানে বাবা মারা ছেলেদের সঙ্গীসাথী, ইস্কুলের লেখাপড়া সম্বন্ধে দেখান বেশ আগ্রহ। আবার কেউ হয়তো আসে প্রায়-অশিক্ষিত পরিবার থেকে, কেউ হয়তো আসে এমন জনবহুল বস্তি থেকে, যেখানে শৈশবের সকল প্রয়োজনই রয়ে যায় শিশুর নাগালের বাইরে। কাজেই এদের মধ্যে লেখাপড়ায় তারতম্যও দেখা যাবেই যাবে।

একটি শিশুর কাছে বই-ই হবে সহজ আনন্দ ও কৌতূহল পরিতৃপ্তির জিনিষ। আর একজনের কাছে মনে হবে স্কুল-জীবন ছাড়া বইয়ের জায়গা নেই আর কোথাও। তৃতীয় জনের কাছে বই একটা অর্থহীন জিনিষ বলেই মনে হবে। ফলে হবে কি, প্রথম শিশুটি হবে যথেষ্ঠ পরিমাণে শব্দ-সম্পদের অধিকারী। লেখা ও কথায় তার প্রকাশ-ভঙ্গী, শেখাবার আগেই সহজ প্রকাশের পথ খুঁজে পাবে। দ্বিতীয় জনও হয়তো শিখবে—কিন্তু বিদেশী ভাষা শিখতে যেমন কষ্ট করতে হয়, তাকেও শিখতে তেমনি কষ্ট করতে হবে এবং সে শিক্ষা তার ঘরের মতন সহজ হয়ে উঠবে না; অপরদিকে তৃতীয় শিশুটির শব্দ-ভাণ্ডার হবে খুব সামান্যই এবং তাদের ব্যবহারও সে ঠিকমত করতে পারবে না।

তাই আমরা বলতে চাইছিলাম যে, সামাজিক স্তরও শিশুর লেখাপড়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কারণ, যে-শিশু শিক্ষিত ও সংস্কৃত পরিবেশের মধ্যে মানুষ, তার লেখাপড়ায় মন, কৌতূহল, অপেক্ষাকৃত হীন পরিবেশের মধ্যে লালিত শিশুর অপেক্ষা বেশী ও

বিচিত্র হবারই সম্ভাবনা। শিশুদের মধ্যে লেখাপড়ায় এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকার জন্য, উচ্চ বুদ্ধিই একমাত্র দায়ী নয় ; তাদের বয়স, বাড়ীর অবস্থা মেজাজ এসবগুলিও বিবেচনা করে দেখা দরকার।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে শিশুর অনুপস্থিতি :—বিদ্যালয়ে শিশুর পিছিয়ে পড়ার যতগুলি কারণ জানা গেছে, তার মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কারণ, বিদ্যালয়ে শিশুর অনুপস্থিতি। প্রায়ই দেখা যায় যে, 'পিছিয়ে পড়া' এইসব শিশু মাঝে-মাঝেই এবং অনিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। এই অনিয়ামত অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, এর মধ্যে অধিকাংশ দিনই শিশু বা তার পরিবারের আত্মীয়-স্বজন অসুস্থ থাকেন। প্রথম প্রথম এই অনুপস্থিতির জন্য শিশুর যে কোন অসুবিধা হচ্ছে তা বোঝা যায় না, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে শিশু তার অন্য সঙ্গীদের চাইতে অনেক পিছনে পড়ে আছে। তখন শিশুর অক্ষমতার কারণ বেশীর ভাগ শিক্ষক এবং আত্মীয়-স্বজন বুঝতে পারেন না। তাঁরা হয়তো শিশুকে অযথা উপদেশ দিতে থাকেন কিংবা তাড়না করেন।

কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে, শিশুর বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির তেমন কোন কারণ নেই—সেটা শুধু মাত্র অভিভাবকদের শৈথিল্যের জন্যই হয়েছে। সবচাইতে অসুবিধাজনক ব্যাপার, যদি শিশুর অভিভাবকেরা খুব বেশী বাসস্থান বদলাতে বাধ্য হন। এসব ক্ষেত্রে শিশুকে একটি বিদ্যালয় হতে নিয়ে, তার নতুন বাসগৃহের কাছের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। কিন্তু পুরানো বিদ্যালয় হ'তে আসা এবং নতুন বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এ দুই এর মধ্যের দিনগুলিতে শিশুর যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এছাড়াও নতুন বিদ্যালয়ের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে

নেবার জন্য শিশুর যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। এর তিন চার মাস পর যখন শিশু নতুন বিদ্যালয়ের সাথে মাত্র নিজেকে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করছে, তখন যদি তাকে আবার এ বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে নতুন বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়, তবে তা' শিশুর পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। শিশু তীক্ষ্ম বুদ্ধিশালী হলেও বার বার বাধা পাওয়ার জন্য এসব ক্ষেত্রে শিশুর বুদ্ধি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না।

অধ্যাপনায় দক্ষতার অভাব—বিদ্যালয়ে যদি প্রায়ই শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বদল হয়, তাহলে তাও শিশুর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যে বিদ্যালয়ে প্রায়ই নতুন শিক্ষয়িত্রী আসেন সেখানে পড়াশুনার খানিকটা ব্যাঘাত হয়—সেটা সকলেই জানেন। শিশুদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান এবং যারা সব অবস্থার সাথে নিজেকে খুব তাড়াতাড়ি খাপ খাইয়ে নিতে পারে তারা এই ক্ষতিটুকু নিজের চেষ্টায় শুধরে নিতে পারে। কিন্তু যারা তা পারে না, এবং যারা একটু কম বুদ্ধিমান তারা ক্রমেই অন্যদের চাইতে পিছিয়ে পড়ে। প্রায়ই দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ের যিনি সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষক, তিনিও বুদ্ধিমান ও ক্লাশে যারা এগিয়ে গেছে এরকম ছাত্রদেরই পড়ান—কিন্তু অধিকবয়স্ক ও অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান ছাত্রদের উপর তেমন দৃষ্টি দেন না। ফলে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রের সংখ্যা বাড়ে। এতে শিক্ষককে সম্পূর্ণ দোষী করা যায় না। কারণ, এই শিশুদের অক্ষমতা কিছুটা আগে থেকেই ছিল। তবে আজকাল অনেক বিদ্যালয়ে সবচাইতে অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকের ওপর বিদ্যালয়ের 'পিছিয়ে-পড়া' শিশুদের ভার দেওয়া হয়।

ছাত্রছাত্রীর অক্ষমতার জন্য অধ্যাপনাই দায়ী, একথা অনেকেরই মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপনার জন্য খুব কমই অক্ষমতার বা পিছিয়ে-পড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। তবে কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে, শিক্ষক যে বিষয়ে কাঁচা, সে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীও কম জানে। যেমন

ধরা যাক্ যে-শিক্ষক বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পঠন (রিডিং পড়া) শিক্ষা দেন, তিনি যদি পঠনে দক্ষ না হন, তাহলে দেখা যায় যে, সে শ্রেণীর অনেক ছাত্রই পঠনে দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান ছাত্রেরা যে কেবলমাত্র পঠনেই পিছিয়ে পড়ে তা নয়, যে-সব বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হলে পঠনের প্রয়োজন সে বিষয়-গুলিতেও পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর অধ্যাপনার দোষেই যে শিশু অক্ষম হয়, তা নয়, তবে অনেক সময় দেখা যায় যে শিশু কি চায় তার দিকে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী মোটেই দৃষ্টি দেন না। সেজন্য শিশু তার পাঠ ভাল বুঝতে পারে না, সে বিষয়ে সে সাময়িক-ভাবে হয়তো পিছিয়ে পড়ে। এছাড়াও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী যদি পক্ষপাতিত্ব করেন তবে ছাত্রছাত্রীর পক্ষে সেটা খুবই খারাপ ফল হয়। এতে যে-সব ছাত্রছাত্রী একটু উৎসাহ পেলে নিজের অক্ষমতাটুকু সারিয়ে নিতে পারে বা সারিয়ে নিতে চেষ্টা করতে পারে, তারা নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতন ও নিরাশ হয়ে পড়ে, যার জন্য নিজের অক্ষমতা সারাতে সে কোনরকম চেষ্টাই করে না। ফলে যারা একটু চেষ্টাতেই নিজের দোষ শুধরে নিতে পারত, তাদের চেষ্টার অভাবে অক্ষমতা বেড়েই যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শিশুদের ভুল বা দোষ দেখলে শুধরে না দিয়ে তাই নিয়ে উপহাস করেন। এতে শিশুর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে এবং যে ভুল অল্প আয়াসেই সারানো যেতো সে সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে পড়ার জন্য, তা সারানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর দোষ ছাড়াও বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ভুলেও শিশুরা অনেক সময় পিছিয়ে পড়ে। এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে ওঠবার সময় যদি শিশুরা তার উপযুক্ত কি না তা ভাল করে না পরীক্ষা করা হয়, তবে অনুপযুক্ত শিশুরা ক্রমেই পেছিয়ে পড়ে। শিশুদের

পড়াশুনার পিছিয়ে পড়ার জন্য বিদ্যালয়-ব্যবস্থা যতটা দায়ী তার মধ্যে বেশীর ভাগেরই কারণ, শিশুর ঘন-ঘন বিদ্যালয় পরিবর্তন।

প্রকৃতিগত দোষ

অনেক সময় দেখা যায় যে, খুব চঞ্চল-শিশুরা তাদের সঙ্গীদের থেকে পিছিয়ে পড়ছে। সব ক্ষেত্রেই এর জন্য শিশুর বুদ্ধির অভাব আছে মনে করলে ভুল হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, এই সব 'পিছিয়ে পড়া' শিশুদের মধ্যে কেউ কেউ ভবিষ্যতে এমন অনেক কাজ করে, যাতে যথেষ্ট বুদ্ধির প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে এই রকম কোন-কোন শিশুর অক্ষমতার কারণ, শিশু স্থির হয়ে থাকতে না পারা। আবার কোন-কোন শিশু কোন রকম স্নায়বিক দৌর্বল্যের জন্যও পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারে না। কোন-কোন শিশুকে খুব বেশী নির্জীব বলে মনে হয়। এদের এই নির্জীবতা পারিপার্শ্বিক কারণে খুব কমই হয়। বেশীর ভাগ সময়েই দেখা যায় যে, এ-দোষ শিশুর সহজাত। বুদ্ধির অভাবও এ-নির্জীবতার কারণ হতে পারে, কখনও শারীরিক অসুস্থতাও এর একটি কারণ বলে দেখা গেছে। তবে শিশুটি সত্যিই নির্জীব, না সে তার অনুভূতি প্রকাশ করে না তা বোঝা সত্যিই শক্ত।

প্রকৃতিগত দোষের মধ্যে নৈতিক দোষও ধরা হয়। মনস্তাত্ত্বিকেরা অবশ্য নৈতিক দোষকে পিছিয়ে পড়ার কারণ বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে, অক্ষমতার ফলই নৈতিক দোষ। সুতরাং কি কারণে শিশু অসাধু উপায় অবলম্বন করে এবং কি কারণে শিশু পরিশ্রমবিমুখ হয়, তার কারণ অনুসন্ধানই সব চাইতে প্রয়োজন।

শিশুদের অসাধু উপায় অবলম্বন—বেশীর ভাগ সময়ই দেখা যায়, যে-শিশুরা অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান তারাই এই উপায়

অবলম্বন করে। এর কারণ, শিশুরা যখন নিজের কম বুদ্ধির জন্য বা অন্য কোন কারণে পড়া আয়ত্ত করতে পারে না, তখন ঐ উপায় অবলম্বন ক'রে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর কাছ থেকে প্রশংসা পেতে চায় অথবা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর তাড়না বা উপহাস থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শিশুরা অঙ্কের ক্লাশেই বেশী অসাধু উপায় অবলম্বন করে। এতে যে সব সময়েই তাদের বুদ্ধির অভাব বোঝা যায় তা নয়—অনেক সময় তাদের পরিশ্রমবিমুখতাই এর কারণ। শিশুদের এই অসাধু উপায় অবলম্বন করবার জন্য শিশু যতটা দায়ী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীও ঠিক ততটাই দায়ী। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী যদি মনে করেন যে 'প্রশ্নের উত্তর' ঠিক হলেই সমাধান হয়ে গেল, কি উপায়ে শিশু অঙ্কটা করেছে, তা জানবার প্রয়োজন নেই, তবে তা শিশুর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর এই মনোভাবের জন্য শিশুদের অসাধুতা ক্রমেই বেড়ে যায়। কিন্তু গোড়াতেই যদি এদিকে ভাল করে নজর দেওয়া হয়, তবে শিশুদের এই দোষ শীঘ্রই সেরে যায়।

শিশুদের পরিশ্রমবিমুখতা

শিশুদের পরিশ্রমবিমুখতার প্রধান কয়েকটি কারণ নীচে দেওয়া গেলো।

(১) শারীরিক অসুস্থতা

(২) প্রকৃতিতে স্থৈর্যের অভাব

(৩) স্নায়বিক দৌর্বল্য

(৪) বুদ্ধির অভাব

যদি শিশুর শারীরিক অবস্থা ভাল থাকে তবে প্রায়ই দেখা যায় যে শিশুর অলসতার কারণ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে।

যদি কোন অতিরিক্ত বুদ্ধিমান শিশুকে তার সামর্থ অপেক্ষা নিম্ন-শ্রেণীতে পাঠ নিতে দেওয়া হয়, তাহা হলে দেখা যায় যে, শিশু ধীরে ধীরে পরিশ্রমবিমুখ হয়ে পড়ছে। কারণ সে জানে, অল্প চেষ্টাতেই সে তার সঙ্গীদের সমান পড়া তৈরী করতে পারে। ঠিক তেমনই যদি কোন কম বুদ্ধিমান শিশুকে তার সামর্থ অনুযায়ী শ্রেণীতে না দিয়ে, অপেক্ষাকৃত শক্ত ও ওপরের শ্রেণীতে দেওয়া হয়, তা হলে দেখা যায় যে, শিশু প্রথম কিছুদিন বেশ চেষ্টা করে কিন্তু তারপরই নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়ে ও পাঠে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে বা পাঠ আয়ত্ত করতে কোনরকম চেষ্টাই করে না। এতে ধীরে ধীরে সে অলস হয়ে পড়ে। যে সব শিশু নির্জীব বা অল্পতেই নিরাশ হয়ে পড়ে তাদের মধ্যেও অলসতা দেখা যায়। তাদের যদি সব সময় উৎসাহিত না করা হয়, তবে তাদের এই আলস্য কাটিতে চায় না। যে-শিশুদের প্রকৃতি অন্তর্মুখী ও কল্পনাপ্রিয়, তারা অধিকাংশ সময়েই নিজেদের জল্পনা-কল্পনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে, অন্যদিকে মন দেবার সময় তাদের থাকে না। তার চারপাশের সবাই তাকে অলস বলেই ধরে নেয়।

স্নায়বিক দৌর্বল্যের জন্যও অনেক সময় আলস্য আসতে পারে। যে-সব শিশু অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারা তাদের সেই ক্লান্তির জন্যই কোন কাজে বা পাঠে মন দিতে পারে না। এছাড়া কোন কোন শিশুকে মাত্র একটি বা দুইটি বিষয়েও আলস্য প্রকাশ করতে দেখা যায়। তবে যে কারণেই আলস্যের উদ্ভব হোক না কেন, তা শিশুর ভবিষ্যতের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়—তা সে-শিশু যত বুদ্ধিমানই হোক্ না কেন।

শিশুদের এই আলস্য দূর করতে হলে যেসব কারণে মানসিক অবসাদের সৃষ্টি হয়, সে সব কারণ দূর করতে হবে। অনেক সময় শিক্ষক ও শিশুর অভিভাবকেরা বলেন যে শিশুর খেলাতে বেশ মন আছে কিন্তু

সে পড়াশুনাতে খুব অমনোযোগী ও লেখাপড়ার জন্য কোনরকম পরিশ্রম করতে চায় না। এসব ক্ষেত্রে শিশুকে তাড়না করলে বা শুধুমাত্র উপদেশ দিলেও কোন লাভ নেই। শিশুর মনোযোগ খেলার মাঠে যেমন আকৃষ্ট হয়, ঠিক তেমনি যাতে পাঠের দিকেও আকৃষ্ট হয় তার চেষ্টা করতে হবে। ছড়া, ছবি শিশুকে খুব আকৃষ্ট করে; পাঠ্যবিষয় যদি ছবির সাহায্যে শিশুকে বোঝান হয়, তাহলে অনেক সময়ে খুব কাজ হতে দেখা যায়। শিশুর প্রকৃতিগত অন্য দোষ থাকলে মনস্তাত্বিকদের পরামর্শ নেওয়াই সবচাইতে ভালো ও প্রয়োজনীয়।

বুদ্ধির অভাব

বিদ্যালয়ে শিশুর পিছিয়ে পড়ার একটা প্রধান কারণ যে, অধিকাংশক্ষেত্রেই তার বুদ্ধির অভাব তা সকলেই স্বীকার করেন। যেসব শিশুদের বুদ্ধির মান সাধারণ শিশুদের বুদ্ধির চাইতে সামান্য কম, তাদের অক্ষমতা সাবানো যায়। উপযুক্ত তত্বাবধান ও বিশেষ অধ্যাপনার দ্বারা এদের সাধারণ আর পাঁচজন শিশুর সাথেই শিক্ষিত করা যায়। কিন্তু বুদ্ধির মান যাদের সাধারণের চাইতেও অনেক কম তাদের শিক্ষিত করে তোলা সহজ নয়, এক কথায় বল্‌তে গেলে—প্রায় অসম্ভবই। এখন দেখা যাক্ যে এই যে বুদ্ধির অভাব, এটা কি পারিপার্শ্বিকের ওপর নির্ভর করে না বংশগতিই এর জন্য দায়ী।

(ক) একজন মনস্তাত্বিক দুইটি যমজ শিশুকে নিয়ে তাঁর গবেষণা সুরু করেন। শিশু দুইটি যমজ হলেও বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রতিপালিত হয়েছিল কিন্তু অনুসন্ধানের ফল হতে জানা যায় যে:—

(১) দুইটি শিশুই লেখাপড়া করতে সমান ভালবাসে।

(২) দুইটি শিশুই একই সময়ে যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়।

(৩) তাদের বুদ্ধি পরীক্ষা করেও দেখা গেছে যে তাতেও কোন অভাব নেই।

ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, তেরটি নির্বোধ শিশুর পারিবারিক ইতিহাস আলোচনা করে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের একটা তালিকা প্রস্তুত করেছেন, সেই তালিকা থেকেও আমরা জানতে পারি যে,

তেরটী শিশুর মধ্যে,

৩টী শিশুর পিতামাতার বুদ্ধির মান সাধারণ অপেক্ষা কম।

২টী " পিতা মদ্যপায়ী।

১টী " পিতা চরিত্রহীন ও বদরাগী।

শিশু কয়টির ভাই বোনদের মধ্যে,

প্রত্যেকেই পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়েছে।

প্রত্যেক তিনটী ভাই বোনের মধ্যে দুইটী নির্বোধ।

প্রত্যেক তিনটী ভাই বোনের মধ্যে ১টী মৃগী রোগী।

প্রত্যেক তিনটী ভাই বোনের মধ্যে ১টির বুদ্ধি সাধারণের চাইতে অনেক কম।

সম্পর্কীয় ভাই বোনদের মধ্যে

৬জন পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়েছে।

৫ জন নির্বোধ (মামাত ভাই বোন)।

৩ জন মৃগী রোগাক্রান্ত।

উপরের তালিকা ছাড়াও এই তেরজন বালকবালিকার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে, অনেকেরই বুদ্ধির মান সাধারণের চাইতে কম। এতেই বোঝা যায় যে, বুদ্ধির মান পারিপার্শ্বিকের চাইতে বংশগতির উপরই নির্ভর করে বেশী।

জড়বুদ্ধি শিশু বলতে কাদের বুঝি

আগেই আলোচনা করেছি যে, সব মানুষের বুদ্ধি সমান থাকে না। যাদের বুদ্ধির মান সাধারণের চাইতে অনেক কম, পৃথিবীতে নিজের সত্তাটুকু বজায় রাখতে যাদের অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়, সাধারণতঃ জড়-বুদ্ধি বলতে আমরা তাদেরই বুঝি। শারীরিক বিকাশের সাথে সাথে এদের মানসিক বৃত্তিগুলি বিকশিত হয় না। পার্থিব প্রয়োজন, অপ্রয়োজন উপলব্ধি করবার শক্তি এদের নেই। দৈনন্দিন ছোট ছোট সমস্যার সমাধানও এরা নিজের বুদ্ধির সাহায্যে করতে পারে না। পরিবারের আত্মীয়-স্বজন, সমাজ সকলেই এদের নিয়ে বিব্রত। মনস্তাত্ত্বিকেরা এই জড়বুদ্ধি বালক-বালিকাদের বুদ্ধির মানের তারতম্য অনুসারে তিনভাগে ভাগ করেছেন। নির্বোধ, স্বল্পবুদ্ধি ও অপরিণত বুদ্ধি।

নির্বোধ (idiot) শিশু

জড়বুদ্ধি শিশুদের মধ্যে এদের বুদ্ধির মানই সব চাইতে কম। বোধশক্তি এদের একেবারেই নেই। নিজেকে কি উপায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় তারা জানে না—নিজেদের জামা-কাপড়ও এদের পরিয়ে দিতে হয়। এদের মধ্যে আবার অনেকের অনেক মানসিক বৃত্তিগুলি একেবারেই বিকশিত হতে পারে না—জীবন ধারণের জন্য খাদ্যদ্রব্যও এদের মুখে তুলে দিতে হয়, নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝে খাবার শক্তিটুকুও এদের নেই। প্রায়ই দেখা যায় এই শ্রেণীর শিশুরা যুক্তাক্ষরও বলতে পারে না।

স্বল্পবুদ্ধি শিশু

এদের বুদ্ধির মান নির্বোধ শিশুদের বুদ্ধির মান থেকে কিছু বেশী। সাধারণ বিপদ-আপদ থেকে এরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে। কিছু-

কিছু কথা এরা বলতে পারে কিন্তু লেখাপড়া শিখবার মতো ক্ষমতা এদের নেই। এদের মধ্যে যাদের বুদ্ধির মান একেবারেই কম, তারা কোন কাজেরই উপযুক্ত নয়। অন্যেরা অপরের তত্ত্বাবধানে কিছু কিছু সহজ কাজ করতে পারে। স্বল্পবুদ্ধি বালক-বালিকারা নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সক্ষম, নিজেদের কাপড় জামা নিজেরাই পরতে ও নিজেরাই খাওয়া-দাওয়াও করতে পারে। তবে অন্যের তত্ত্বাবধান ছাড়া কোন সহজ কাজও এদের ওপর নির্ভর করে দেওয়া উচিত নয়।

অপরিণত বুদ্ধি শিশু

জড়বুদ্ধি শিশুদের মধ্যে এদের বুদ্ধির মানই সব চাইতে উঁচু স্তরের। অপরের তত্ত্বাবধান ছাড়াও দৈনন্দিন তালিকা-ভুক্ত সহজ কাজগুলি এরা করতে পারে। এদের মধ্যে যাদের বুদ্ধির মান অপেক্ষাকৃত বেশী তারা সেলাইয়ের কাজ, কারিগরের কাজ, শিশুদের দেখাশুনার কাজ বেশ ভালভাবেই করতে পারে। অবসর সময় কি করে যাপন করতে হয়, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, এ-বোধশক্তি এদের নেই—তাই শিশু অপরাধীর সংখ্যা এদের মধ্যে বেশী, ছাত্রজীবনের নিত্য নতুন সমস্যা সমাধান করবার বা পাঠ্য বিষয় বোঝবার মতো বুদ্ধি এদের নেই, সেজন্যই জড়বুদ্ধি শিশুরা বিদ্যালয়ে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ে।

কেন এই জড়ত্বের সৃষ্টি হয়

মনস্তাত্বিকেরা এ বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁদের গবেষণার ফল আলোচনা করলে আমরা জড়ত্বের কারণ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারি। এই (জড়ত্ব) সমস্যা সমাধানের জন্য মনস্তাত্বিকেরা জড়বুদ্ধি শিশুদের পারিবারিক ইতিহাস পর্যালোচনা করাই সবচাইতে প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। তাঁদের

আলোচিত বিভিন্ন পারিবারিক ইতিহাসগুলি হ'তে আমরা দেখতে পাই যে, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিক ধারাই জড়বুদ্ধির জন্য দায়ী। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী জড়বুদ্ধির ক্ষেত্রে খুব কমই প্রভাব বিস্তার করে। তবে কোন-কোন সময়ে মস্তিষ্কে আঘাত লাগার পর কিংবা কোন বড় অসুখের পরও বুদ্ধিভ্রংশ হতে দেখা যায়!

প্রতিকারের উপায়

মনস্তাত্ত্বিকেরা এই সব জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের সাধারণ শিশুর পর্যায়ে নিয়ে আসতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ ধরণের কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই ; তবে এর মানে এই নয় যে, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বালক-বালিকার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজন নেই বা তারা অবহেলার পাত্র। সাধারণ শিশুদের যতটা যত্নের প্রয়োজন, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বালক-বালিকাদেরও ততটা যত্ন ও সহানুভূতির প্রয়োজন, তবে এদের একেবারে সাধারণের মত হ'তে আশা করা ভুল।

উপযুক্ত শিক্ষা দিলে এসব শিশুদের যতটা সামর্থ্য আছে ততটা এরা কাজে লাগাতে পারে। জড়বুদ্ধি শিশুকে কোন রকম শিক্ষা দিতে হলে তাকে যত শৈশব হতে শিক্ষা দেওয়া যায় ততই ভালো। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন বালক-বালিকাদের লেখাপড়া শেখাতে হলে বিশেষভাবে গঠিত বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। সাধারণ শিশুদের সাথে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিলে এদের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় না। অন্য কোন রকম শিক্ষা দিতে হলে কোন-কোন কাজের পক্ষে শিশুটি উপযুক্ত, সেটা পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া তারা সব সময় তাদের চারিদিকে যা দেখছে বা শুনছে তার বিষয়ও তাদের জান্‌বার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক জড়-বুদ্ধি শিশুকে যে একই প্রকারের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে তা নয়, যে বালক-বালিকা যে-বিষয়ে খানিকটা দক্ষতা দেখাতে পার্‌বে,

যার যে-বিষয়ে শেখবার আগ্রহ আছে তাকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যে-কাজে কোন রকম নতুনত্ব নেই, একঘেয়ে কাজ—এই রকম কাজই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বালক-বালিকারা চমৎকার করতে পারে। তারা প্রতিদিন একই ধরণের কাজ করতে ভালবাসে। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান বালক-বালিকা এই ধরণের কাজ প্রত্যহ করতে বিরক্তি বোধ করবে।

জড়বুদ্ধি শিশুদের মধ্যে যাদের লেখাপড়া শেখানো চলতে পারে, তাদের জন্য বিশেষজ্ঞরা সাধারণভাবে যে পাঠ্য তালিকা স্থির করেছেন, তাতে শিশুর সামাজিক ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিবেশ অনুযায়ী কাজ চলার মতন পড়া, লেখা ও গণিতের ওপর তাঁরা জোর দিয়েছেন।

পড়া বলতে এ-ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে—রাস্তার নাম পড়তে শেখা, পথচিহ্ন বুঝতে শেখা, মূল্য তালিকা, বিজ্ঞাপন, গৃহস্থালী দ্রব্যাদির নাম, খেলাধূলার খবর পড়তে পারা ইত্যাদি।

লেখা ও বানানের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে—সহজ চিঠি ও দরখাস্ত লিখতে শেখা।

গণিতের শিক্ষাকে—বাজার ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে শেখার মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছে।

সুস্থ ভাবে জীবন যাপন করতে গেলে, যেটুকু স্বাস্থ্যবিধি জানা নিতান্ত প্রয়োজন তাও এই শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

মানসিক আবেগ-অনুভূতির উৎকর্ষ ও স্থৈর্যের জন্য শিল্প, সঙ্গীত, ছন্দ ও নাটকাদিকেও এদের শিক্ষায় স্থান দেওয়া হয়েছে।

মোটের উপর এই সব শিক্ষার মধ্যে দিয়ে জড়বুদ্ধি শিশু যাতে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে, যথা সম্ভব স্বাধীন ও আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে, তাই হবে শিক্ষক ও অভিভাবকের লক্ষ্য।

এই প্রসঙ্গে এই কথাটাও মনে রাখা দরকার যে, দেশের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য জড়বুদ্ধি স্ত্রী-পুরুষের কোন সন্তান সন্ততি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

'পিছিয়ে পড়া' শিশুদের অক্ষমতা কি করে সারানো বা কমানো যায়

'পিছিয়ে পড়া' শিশুদের অন্য সব সাধারণ ছেলেদের স্তরে আনবার চেষ্টা করতে হলে, সব চাইতে প্রথমে, কেন এই শিশু 'পিছিয়ে পড়ছে' তার কারণ জানতে হবে। সেটা তার দৈহিক অবস্থা, মানসিক-বৃত্তি বিকাশের অপরিপূর্ণতা, সামাজিক বা পারিপার্শ্বিক অব্যবস্থা—কোনটার জন্য তা জানা প্রয়োজন। তুচ্ছ বলে কোন কারণকে অবহেলা করা চলবে না। যদিও তুচ্ছ কারণে অক্ষমতা না হতেও পারে, তবুও এই তুচ্ছ কারণই হয়তো শিশুর চিকিৎসার বিঘ্ন ঘটাতে পারে, শিশুর শারীরিক অবস্থা, সামাজিক অব্যবস্থা অথবা শিক্ষার দোষ যদি এই পিছিয়ে পড়ার কারণ হয়, তবে তা দূর করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু মানসিক কোনরূপ দুর্বলতার জন্য যদি এর সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তা দূর করবার একমাত্র উপায়, বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থা

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই বিশেষ ব্যবস্থা কি রকম হবে? সর্ব-প্রথম এই শিশুদের প্রয়োজন, পৃথকভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা করা। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে, অন্য শিশুদের সাথে যদি এদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে শিক্ষকেরা অধিকাংশ ছেলেরা যতটা পড়া শিখতে পারে তার উপর নির্ভর করেই এগিয়ে যান। পিছিয়ে পড়া দু' একটি শিশুর উপর তাঁর পড়ে দৃষ্টি না। এই পিছিয়ে পড়া শিশুরাও প্রথম প্রথম তার শ্রেণীর

অন্য শিশুদের সাথে এগিয়ে যেতে খুবই চেষ্টা করে, অল্পদিন পরেই নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে পড়ে এবং এতে যেটুকু চেষ্টা সে প্রথমে করছিলো তাও ছেড়ে দেয়। ফলে সে আরও পিছিয়ে পড়তে থাকে।

এ ছাড়া দেখা যায় যে, একটি 'পিছিয়ে পড়া' শিশুর অক্ষমতার কারণ অপর 'পিছিয়ে পড়া' শিশুর অক্ষমতার কারণ হতে আলাদা, কাজেই সব 'পিছিয়ে পড়া' শিশুকে যদি একই রকম শিক্ষা দেওয়া যায় তাতেও ফল বেশী হবে না। কারণ এই 'পিছিয়ে পড়া' শিশুদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন ব্যক্তিগত যত্ন ও ব্যক্তিগত তদারকের এবং সেই অনুযায়ী তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, একটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি শিশু যাতে লেখাপড়ায় সমানভাবে এগিয়ে যায়—সেদিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি কোন শিশু, শ্রেণীর অপর শিশুদের চাইতে বেশী এগিয়ে যায় অথবা পিছিয়ে পড়ে, তবে তার শিক্ষার পৃথক ব্যববস্থা করতে হবে। যদি কোন শিক্ষক একই শ্রেণীতে প্রত্যেক শিশুর সাথে পিছিয়ে পড়া শিশুটিকেও একইভাবে শিক্ষিত করতে চান, তবে তাঁকে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হবে, কাজেই 'পিছিয়ে পড়া' শিশুদের শিক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পাশ্চাত্য দেশে এই সব শিশুদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই ধরণের বিদ্যালয়গুলিতে বয়স অনুপাতে খুবই কম পড়ে—এইরূপ শিশুর সংখ্যাই সেখানে বেশী। এই রকম কোন কোন বিদ্যালয়ে ১১ বছরের উপরের বয়সের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা হয়। পরে মানসিক বিকাশ অনুসারে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

বিশেষ শ্রেণী ব্যবস্থা

কিন্তু এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের অসুবিধা অনেক। কারণ এইরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপন ব্যয়সাপেক্ষ—তাছাড়া 'পিছিয়ে পড়া' শিশু যদি

সংখ্যায় যথেষ্ট না পাওয়া যায়, তবে একটি বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করাও সম্ভব নয়। কাজেই 'পিছিয়ে পড়া' শিশুদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন করার চাইতে পৃথক শ্রেণীতে এদের পড়াবার বাবস্থা করা অনেক অল্প-ব্যয়সাপেক্ষ। যদি একই বিদ্যালয়ে অন্য সব শ্রেণীর মতো 'পিছিয়ে পড়া' ছেলেদের জন্য বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করা হয় তাহলে অনেক দিক থেকেই সুবিধা হয়।

প্রথমত তাতে শ্রেণীর সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী থেকে 'পিছিয়ে পড়া' শিশুটিকে পৃথক করবার সুবিধা হয় এবং কম সময়ের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও যারা মানসিক দুর্বলতায় ভুগ্‌ছে অথবা যারা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, তারা ছাড়া অন্য শিশুরা—যারা কোন কারণে সামায়িকভাবে পিছিয়ে পড়েছে, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার পর যখন তারা অন্য পাঁচটি শিশুর সমান উপযুক্ত হ'তে পারে, তখন তাদের আগের শ্রেণীতে ফিরে যাওয়ার সুবিধা হয়। মানসিক-দুর্বল শিশু ছাড়া অন্য 'পিছিয়ে পড়া' শিশুদের সাধারণ শ্রেণীতে ফিরে যাবার জন্য কতটা সময়ের প্রয়োজন তা নির্ভর করবে ব্যক্তিগত যত্ন, সুশিক্ষার ব্যবস্থা ও শিশু কতটা পিছিয়ে পড়েছে, কি কারণে পিছিয়ে পড়েছে তার উপর। যদি 'পিছিয়ে পড়া' শিশুদের জন্য পৃথক শ্রেণী গঠন করা খুবই অসুবিধাজনক হয়, তবে সাময়িক ভাবে একই শ্রেণীতে যে ক'টি 'পিছিয়ে পড়া' শিশু আছে তাদের নিয়ে বিশেষ অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্য শিশুদের চাইতে বেশী সময় ও বেশী যত্ন দিয়ে, এদের জন্য বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময় ছাড়াও অন্য সময়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। এই সব শিশুর সাথে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে তাদের আত্ম-মর্যাদায় আঘাত না লাগে—অথবা তাদের অক্ষমতা সম্বন্ধে তারা অতিরিক্ত সচেতন হয়ে না পড়ে।

'পিছিয়ে পড়া' শিশুর পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষার প্রয়োজন আছে ঠিকই—কিন্তু তাই বলে সব সময়েই তার ওপর জোর দেওয়া উচিত নয়।

কারণ, সমবেত ভাবে শ্রেণীতে পাঠ দিলে ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ বোধ বেশী হয়। গল্প, নীতি, সামাজিক, স্বাস্থ্য, নাগরিক-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলিও সম্ভব ক্ষেত্রে একই সাথে দেওয়া দরকার।

অতিরিক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা

শিশুদের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিশু কোন বিষয়ে কাঁচা? একটি 'পিছিয়ে পড়া' শিশু সব বিষয়ে কাঁচা না হতেও পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে, শিশুরা তিনটি প্রধান বিষয়ে কাঁচা হয়। পঠন, বানান ও অঙ্ক। একটি বা দুইটী বিষয়ে শিশুটির অজ্ঞতার জন্য শিশুটীকে সব সময় তাড়না করা উচিত নয়। বরং ঐ বিষয়ে সে যাতে অন্য শিশুদের সমান জ্ঞান অর্জন করতে পারে তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন কোন মনস্তাত্বিকের পরামর্শ নেওয়ার। কারণ তাঁরা শিশুকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা কর্‌বার পর, কোন্ উপায় অবলম্বন করলে সব চাইতে সহজে সেই শিশুটীর অক্ষমতা সারানো যাবে তা বল্‌তে পারবেন এবং প্রয়োজন হলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও কর্‌বেন। তবে শিক্ষকদের কে কোন বিষয়ে কাঁচা, কে কতটা পিছিয়ে পড়েছে তার দিকে যেমন নজর রাখতে হবে—তেমনি যিনি এদের পড়াবেন, তিনি পড়াবার ঠিক উপযুক্ত কি না তাও দেখে নেওয়া প্রয়োজন। তাঁর বয়স, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর চালচলন শিশুদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সময় দেখা যায় যে, শিক্ষকদের মধ্যে যাঁর কম কাজ অথবা যিনি কম অভিজ্ঞ, তাঁদের এইসব শিশুদের শিক্ষা দেবার কাজে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এইসব শিশুদের জন্য প্রয়োজন সবচাইতে অভিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষকের। এ ছাড়া এইসব পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষার জন্য শিক্ষকের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।

এই শিশুদের সাথে শিক্ষকের ব্যবহার করতে হবে ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে। পাঠে মনঃসংযোগ করবার জন্য শিশুদের অনুপ্রেরণা দিতে হবে। প্রত্যেক শিশুর উপর সমান ও ব্যক্তিগত ভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে !

কাজেই পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য যে-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে, তাতে শিশুর সংখ্যা যাতে বেশী না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেকটী শিশুর পারিবারিক ইতিহাস, তার জীবন-ইতিহাস ও কে কতটা উন্নতি করছে তার তালিকা রাখা প্রয়োজন।

ছাত্র-শিক্ষক সহযোগিতা

স্কটল্যাণ্ডের হীনবুদ্ধি শিশুদের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক, ফ্রেজার সাহেব বলেন, একই শ্রেণীতে ছাত্র-শিক্ষক সহযোগিতার দ্বারা 'পিছিয়ে পড়া' শিশুদেরও সাহায্য করা যায়। শ্রেণীর প্রত্যেকটি ভালো ছেলেকে একটি করে 'পিছিয়ে পড়া' ছেলেকে সাহায্য করার দায়িত্ব দিলে, তাতে সুফল পাওয়া যায়। খুব বেশী 'পিছিয়ে পড়া' শিশুদের উৎসাহিত করার একটি উৎকৃষ্ট উপায় হলো, শ্রেণীতে কোন নতুন শিশু এলে, তাকে পুরাণো পড়া, শ্রেণীর নিয়মকানুন ইত্যাদি বুঝিয়ে দেবার ভার ঐ 'পিছিয়ে পড়া' শিশুটির উপর দেওয়া। এতে তার আত্মবিশ্বাস জাগে এবং সামাজিক কাজে তার মত লোকেরও যে প্রয়োজন আছে একথা সে বুঝতে শেখে।

যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা

প্রত্যেক 'পিছিয়ে পড়া' শিশুর সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করবার পূর্বে তাকে চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ সামান্য শারীরিক দোষেও মানসিক অবসাদের সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া গ্রন্থি-

গুলি ঠিক মতো কার্যক্ষম আছে কি না দেখানো দরকার ; তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন রকম দোষ থাকলে তারও চিকিৎসার প্রয়োজন।

যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতাই শিশুর পিছিয়ে পড়ার কারণ, তবুও দেখা যায় যে বাড়ীর বা সামাজিক আবেষ্টনীও শিশুর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। কেবলমাত্র চারপাশের আবেষ্টনীই শিশুর শিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এমনও প্রায়ই দেখা যায়। এর প্রতিকারের জন্য সমস্ত দেশেই সমাজ-সেবকদের আজ বিশেষ প্রয়োজন।

সমাজসেবীর দায়িত্ব

এই সব সমাজ-সেবকদের শিশুর অভিভাবকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে এবং দেখতে হবে, যাতে শিশু মুক্ত-বাতাসে নির্দোষ আমোদ প্রমোদ করতে পারে, যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য পায় পরিধেয় বস্ত্রের অভাব না থাকে এবং ঘুমাবারও কোন অসুবিধা না থাকে। শিশুর অবসর সময়ও যাতে ভাল গল্প, খেলাধূলা, ভাল বই পড়ার মধ্য দিয়ে, ভাল সঙ্গীর সাথে কাটে সে বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

কেবলমাত্র শিক্ষকের ওপর নির্ভর করা ভুল—কারণ, শিক্ষকের সাথে ছাত্রের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্র দিনে পাঁচ ঘণ্টা কি ছয় ঘণ্টা। শিশু যদি বিদ্যালয়ে খুব ঘন-ঘন অনুপস্থিত হয়, তবে তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এবং শিশুর পাঠ্য তালিকা এমন ভাবে করতে হবে যাতে শিশু বিদ্যালয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়।

সাধারণ অভিভাবক ও পিছিয়ে পড়া শিশু

সাধারণতঃ অভিভাবকেরা মানতেই চান না যে, তাঁদের ছেলেমেয়েরা অন্যের থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে। তাঁদের ধারণা

সব শিশুই সমান ; কাজেই পাঁচজনে যা পারে তাঁদের শিশুরাও তাই পারবে। তাই শিশুকে যখন ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়তে দেখেন, তখন হয় বিদ্যালয় বা শিক্ষকমশায়দেরই তাঁরা এর জন্য দায়ী করে থাকেন না হয় শিশুর ওপরই এর শোধ তুলে আক্ষেপ মেটান। কিন্তু যাঁরা এই পুস্তিকার আগের পাতাগুলি ও 'শিশুলালনী গ্রন্থমালা'র অন্তর্গত অন্য কয়েকখানি পুস্তিকা পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, সব শিশুই একই রকম ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না, কাজেই সব শিশুই যে সমান হবে এটা আশা করা ভুল। তবে শিশু যে-সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায় তাকে বিকশিত হতে সাহায্য করা সব মা-বাবারই কর্তব্য। সেই পথে যে-সব অন্তরায় এসে উপস্থিত হয়, সেগুলি সযত্নে দূর করে শিশুকে বৃহত্তর জগতেব সম্মুখীন হতে তাঁরা সাহায্য করতে পারেন।

শিশু নেহাৎ জড়বুদ্ধি সম্পন্ন না হলে, শিক্ষা-পথের অন্তরায় গুলি দূর করা কঠিন নয়। তবে প্রশ্ন হতে পারে 'পিছিয়ে পড়া' শিশুতো দেখতে অন্য ছেলেদের চেয়ে একটা অদ্ভুত রকমের কিছু নয়, তবে সাধারণ বাবা মা'রা কি করে ঠিক করবেন যে, তাঁদের ছেলে মেয়ে সাধারণ ছেলেমেয়ের মতন কি না ?

অভিভাবকরা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখেন, তাহলেই তাঁরা শিশুর শিক্ষার পথে অন্তরায় কোথায় তা সহজেই ধরতে পারেন। তাঁরা এইটুকু দেখুন যে, শিশু তার কাজকর্ম সব কিছু চোখের খুব কাছে নিয়ে এসে করে কি না ? পিছন ফিরে কথা বললে সে শুনতে পায় কি না ? ফিস্‌ফাস্ কথা বললে তার শুনতে অসুবিধা হয় কি না ? সে হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয় কি না ? সে অত্যন্ত মেজাজী কি না ? কথা বলায় তার কোন দোষ আছে কি না ? তাকে দেখে অলস প্রকৃতির বলে মনে হয় কি না ? তার মধ্যে পুষ্টির অভাব আছে কিনা ? সে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম পায় কিনা ইত্যাদি।

দৈহিক ত্রুটির জন্যে শিশু সময় সময় লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে। শিশুর মাঝে এই ত্রুটিগুলি দেখলে, ডাক্তারের পরামর্শ মতো তা দূর করলে সুফল আশা করা যেতে পারে। এ-দিক দিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবক সহযোগিতারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শিশু চিকিৎসক ও মনোবিদের সাহায্যও উপেক্ষণীয় নয়। আজকের দিনে প্রতিটি প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই একজন শিশু-চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানী থাকা উচিত বলেই আমাদের মনে হয়।

এছাড়া দূর থেকে শিশুকে তার সঙ্গী সাথীর মধ্যে লক্ষ্য করলে, শিশুর মানসিক স্তর সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অভিভাবক কিছুটা খোঁজ পেতে পারেন। শিশু যখন খেলে তখন লক্ষ্য করুন, সে একলা খেলে না অন্য সাথী খোঁজে ? সে কি তার চেয়ে কম বয়সীদের সাথে খেলতে পছন্দ করে ? যদি সে সমবয়সীদের সাথে খেলে, তবে সে সর্দারী করতে চায়, না দলের একজন হয়েই তুষ্ট থাকে ? যদি সে একলা-একলা থাকতে ভালোবাসে, তাহলে বুঝবেন যে, বোধ হয় তার সামাজিক পরিবেশের কিছু পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে। যদি সে অল্পবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলতে ভালোবাসে, তাহলে বুঝবেন যে, সে তার মানসিক স্তর অনুযায়ী সাথী খুঁজছে এবং তাকে তাহলে 'পিছিয়ে পড়া' শিশুর মধ্যে গণ্য করতে পারেন। অপরপক্ষে খেলায় শিশু যদি সব সময় তার সমবয়সী বা তার চেয়ে বেশীবয়সী সাথীদের মধ্যে সর্দারী করতে চায়, তাহলে সম্ভবতঃ তার উচ্চবুদ্ধিই তার পিছিয়ে পড়ার অন্তরায় বলে ধরতে পারেন—অর্থাৎ যে-কাজ তাকে দেওয়া হয় তার বুদ্ধির তুলনায় তার কাছে সেটা অত্যন্ত হাল্কা বলেই সে কাজ করতে তার মন যায় না। এসব ক্ষেত্রে তার লেখাপড়া বা কাজের তালিকার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

শিশু যদি স্কুলের ছাত্র হয়, সেখানে তাকে যদি পিছিয়ে পড়তে

দেখেন, তবে কোন বিষয়ে সে পিছিয়ে পড়ে, সেইটি আগে জানা দরকার। তারপর কেন পিছিয়ে পড়ছে সেটা জানা দরকার ও সেইমত ব্যবস্থা করা উচিত। এ ক্ষেত্রে, আগে 'পিছিয়ে পড়ার কারণ' স্তবকে যে-যে কথা বলা হয়েছে, সেগুলির কোনটি বর্তমান তাই অনুসন্ধান করা দরকার

শিশুর ক্ষমতানুযায়ী পাঠ ও কাজের প্রয়োজনীয়তা

অনেক সময় দেখা যায় যে 'পারব না' এই রকম একটা হীন ভাবের ভয়েই ছেলেমেয়েরা কোন কাজেই মন দিতে পারে না, ফলে অন্য সকলের থেকে সে পিছিয়ে পড়ে। অভিভাবকদের দেখা উচিত, কি লেখাপড়া, কি অন্য কাজ সব কিছুই যেন শিশুর বয়স ও মনের উপযোগী হয়। মনে রাখতে হবে কৃতকার্যতাই সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে আসে, সমস্ত দেহ-মনে নতুন কাজের প্রেরণা যোগায়। দুশ্চিন্তা, ভয়, ভাবনা, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা থেকে মুক্ত থাকলে, শিশুরা ভালভাবে খেতে পারে, তাদের পরিপাকক্রিয়াও সুন্দর ভাবে হয়, খেলাধুলা তারা আরো বেশী করতে পারে, বেশী করে ঘুমোতে পারে এবং হাসিমুখে খেলার-ছলেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সঙ্গে উপস্থিত নতুন নতুন তত্ত্বের দিকেও মনঃসংযোগ করতে পারে।

অপরদিকে, উপর্যুপরি অকৃতকার্যতা শরীরকে অসুস্থ করে তোলে, উদ্যমকে দাবিয়ে রাখে, খাওয়া, খেলা, ঘুম সব কিছুর পক্ষেই তা ব্যাঘাত ঘটায়। আর তাছাড়া অকৃতকার্যতার কথা কল্পনা করে শিশু কোন কাজে বা পড়ায় মোটেই মন লাগাতে পারে না। ক্রমান্বয়ে অকৃতকার্যতা ঘটতে থাকলে শিশু ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে চায় না, ফলে কম বয়সে সে তো অনগ্রসর হয়েই পড়ে, এমন কি তার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতি ঘটাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়!

এদিক দিয়ে অনেকটা কাজ হতে পারে। শিশুকে ড্রিল, গান, বা বাজনার সাথে সহজ নাচ শিখিয়ে, এ-দিক দিয়ে তাকে সাহায্য করা যেতে পারে। খুব 'পিছিয়ে পড়া' শিশুর পক্ষে ড্রিলের কথা বুঝে কাজ করা কঠিন লাগে, সেক্ষেত্রে গানের সাথে খেলা, সহজ গ্রাম্য নাচ এইসব দিয়ে বাধাটা দূর করা যেতে পারে। সুর, ছন্দ ও তাল মানুষের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে থাকে। 'পিছিয়ে পড়া' শিশুরাও এর দ্বারা বহুলাংশে উপকৃত হয়।

শিশুর মানসিক শক্তিকে একত্রিত করবার জন্য শিশুর সংগ্রহের খেয়ালকে উৎসাহিত করা উচিত। হয়তো বড়দের দৃষ্টিতে ছবি সংগ্রহ, নুড়ি সংগ্রহ, রাংতা সংগ্রহ ইত্যাদি খেয়াল তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে 'পিছিয়ে পড়া' শিশুর কৌতূহলকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য এর প্রয়োজন আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে 'পিছিয়ে পড়া' শিশুকে বেশী করে হাতের কাজ করতে দেওয়া বিশেষ দরকার। কারণ, এর মধ্যে দিয়ে তাদের অতি প্রয়োজনীয় অভাবগুলি পূর্ণ হয়ে থাকে।

পরিশেষে অভিভাবকদের এই কথা মনে রাখতে হবে যে 'পিছিয়ে পড়া' শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন শিক্ষা পদ্ধতি বেঁধে দেওয়া চলে না। যেমন প্রয়োজন দেখা দেয় সেইরকম ব্যবস্থা করা দরকার। কাজের প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর অসুবিধা, অপছন্দ ও অতৃপ্তির ভাব দূর হ'লে ধীরে-ধীরে তার কাছে উচ্চতর কঠিন কাজ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিশুর কাছে "আত্মতৃপ্তিই প্রথম কথা, তারপরে অন্য কিছু।"

* প্রথম প্রকাশ—১৯৫১

দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৯৫৩

* সম্পাদক

নির্মল চৌধুরী

* প্রকাশক

সলিল পাল

কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র

১৩।২, কাঁটাপুকুর থার্ড বাই লেন

হাওড়া

* শিল্পী

রামকৃষ্ণ দত্ত

অরবিন্দ রায়

* মুদ্রক

বৃন্দাবনচন্দ্র নাগ

বঙ্গশ্রী প্রেস

১২।২, মদন মিত্র লেন

কলিকাতা—৬

* প্রাপ্তিস্থান

অশোক লাইব্রেরী

১৫।৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট)

কলিকাতা—১২

শিশু-লালনী গ্রন্থমালা
শিশু-লালনী গ্রন্থমালা

প্রকাশিত পুস্তিকাবলী

১। শিশু ও শৈশব (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

২। শিশু পালনে কোনটা চাই—
বংশগতি না পারিপার্শ্বিক (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

৩। আপনার শিশু কি লেখাপড়ায়
পিছিয়ে পড়ে? (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

৪। কিশোর ও কৈশোর

৫। শিশু অপরাধ ও অপরাধী

৬। শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন (যন্ত্রস্থ)

৭। অবোধ্য শিশু



শিশু-লালনী গ্রন্থ মালা

প্রতিটির দাম
চার আনা মাত্র